দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

টেক্সট বইয়ের আগে বাজারে গাইড বই আসিল কিভাবে?

সারাদেশে এখনো পাঠ্যবইয়ের সংকট চলিতেছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা যথাসময়ে নতুন বই না পাইয়া যারপর নাই হতাশ ও ক্ষুব্ধ। এ সংক্রান্ত ইত্তেফাকের খবরে বলা হইয়াছে যে, এ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণীর কেবল বাংলা, ইংরেজি ও অংক বই বাজারে আনিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই ব্যাকরণ ও সহপাঠ্য ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরের ৭৪টি বইয়ের সহায়ক গ্রন্থ তথা নোট-গাইড বুক যথারীতি পাওয়া যাইতেছে। প্রায় অর্ধশতাধিক প্রকাশনীর নিজস্ব লাইব্রেরীগুলোতে এখন এসব গাইড বই-ই শোভা পাইতেছে। এমনকি সারাদেশেই ইহার দ্রুত বাজারজাত হইয়াছে। বিষয়টি যে কোন বিবেচনায় অতি বিস্ময়কর ও প্রশ্নবোধক। যেখানে জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনের ব্যস্ততা এবং বাঁধাই শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে মূল বই প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া প্রকাশক-মুদ্রাকরগণ অজুহাত তুলিতেছেন, সেখানে এত দ্রুত সময়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত নোট-গাইড বইয়ের চালান আসিল কিভাবে? অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাইতেছে যে, এনসিটিবি হইতে টেক্সট বইয়ের পজিটিভ যথাসময়ে পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশকদের অভিযোগও ছিল মিথ্যাপ্রসূত ও অতিরঞ্জিত। মূলত ইহা এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, অসৎ ও ধুরন্ধর প্রকাশকের সুস্পষ্ট কারসাজি ও ষড়যন্ত্র। তাহারা একদিকে সরকার ও সাধারণ নাগরিকদের বেকায়দায় ফেলিতেছে, অন্যদিকে গাইড বই ক্রয়ে বাধ্য কিংবা উদ্বুদ্ধ করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে মুনাফা লুটিতেছে। এত লেখালেখি ও সরকারের হুঁশিয়ারি উচ্চারণের পর তাহাদের লজ্জা-শরম আছে বলিয়া মনে হয় না। কিছু কিছু বোর্ডবই বাজারে আসার দাবি করা হইলেও তাহা লাইব্রেরিগুলোতে কেন পাওয়া যাইতেছে না সে ব্যাপারে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। ২১ জানুয়ারির পর অন্তত ৩৮টি বই বাজারে থাকার কথা। কাহারা নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসা জমাইয়া তোলার জন্য কৃত্রিমভাবে মূল বইয়ের সংকট সৃষ্টি করিতেছে সে বিষয়টি শীঘ্রই তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। একইসঙ্গে মূল বইয়ের পজিটিভ নোট-গাইডের প্রকাশকগণ কোথায় পাইলেন ইহাও একটি বড় প্রশ্ন। মূলতঃ মূল বই ও নোট বইয়ের প্রকাশক একই প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সহজেই এরূপ অন্যায়-অবৈধ সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বৎসর প্রতিটি টেক্সট বুকের সঙ্গে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্ন সংযুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নোট-গাইডের চাহিদা বাড়িয়াছে। অনেক শিক্ষার্থী, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকগণও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রহিয়াছেন। কোন নূতন নিয়ম চালু করিলে সাধারণত শুরুতেই এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়। আর এই আতঙ্ককে কাজে লাগাইয়া নোট-গাইডের প্রকাশকগণ সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে মাতিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার কারণেও বোর্ড বই ছাপার কাজ ও বাজারজাত বিলম্ব হইতেছে।

জানা যায়, সরকার বোর্ড বইয়ের ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ কমিশন দেয়। ইহার ১৭ শতাংশ পায় খুচরা বিক্রেতারা। পক্ষান্তরে গাইড বইয়ের মূল্য যেমন আকাশচুম্বী তেমনি ইহাতে প্রকাশক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের লাভ তিন-চারগুণ বেশি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নোট গাইডের ব্যবসাই অধিক লাভজনক। ফলে প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট লোকজন প্রথম হইতেই নোট-গাইড প্রকাশনায় সময় দিয়াছেন বেশি। যে কারণে মূল বই পাইতে সারাদেশের গ্রাহকদের এখনো ভোগান্তি পোহাইতে হইতেছে। তাই নোট-গাইড প্রকাশনার ব্যাপারে সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমানে নোট বই সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে সরকারের আইন রহিয়াছে। কিন্তু আইনটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। আইনের যে স্থানে নোট বইয়ের সংজ্ঞা দেয়া হইয়াছে, সেখানে গাইড শব্দটি সরাসরি উল্লেখ করা হয় নাই। যদিও নোট ও গাইড বই একই অর্থ প্রকাশ করে, তবু এক শ্রেণীর প্রকাশক গায়ে পড়িয়া ইহার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করিয়াছেন। এনসিটিবি পরে এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করিয়া জয়ী হইলেও প্রকাশকরা পুনরায় উচ্চ আদালতে আপিল করিয়াছেন। ফলে নোট গাইডের বিষয়টি ঝুলিয়া থাকায় এনসিটিবি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, কোন আনুষ্ঠানিক বক্তব্যও দিতে পারিতেছে না।

এক্ষণে নোট-গাইডের বিষয়ে সরকারের অবস্থান সুস্পষ্ট করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলাবাজার নোট-গাইডের ব্যবসার ওপরই অধিক নির্ভরশীল। এখানে সৃজনশীল প্রকাশনার বিকাশ এখনো সুদূর পরাহত। প্রকাশনা শিল্পও প্রকৃত অর্থে শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় আমাদের অভিমত হইল, তুলনামূলক কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নোট গাইড বই থাকিতে পারে। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে ইহার ব্যাপকতা যেমন রোধ করা দরকার, তেমনি ইহার একটি স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড থাকা আবশ্যক। এজন্য প্রয়োজনে আইন সংশোধন করা দরকার। আমাদের বুঝে আসে না মাত্র এক/দুই সপ্তাহের মধ্যে কিভাবে একটি মানসম্মত নোট-গাইড বইয়ের কাজ শেষ হয়। কেননা ১০ জানুয়ারি থেকেই এসব বই হট কেকের ন্যায় বিক্রি হইতেছে কিংবা গুছাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং নোট-গাইড প্রকাশনাকে মূল বইয়ের প্রকাশনা হইতে পৃথক করারও প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাতে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণারোপ করা সহজ হইবে। ইহাছাড়া আমাদের দেশে দৃঃখজনকভাবে কম-বেশি সকল ব্যবসায় সিন্ডিকেট বিদ্যমান। সিন্ডিকেশন কিংবা অন্য কোনভাবে যাহাতে মনোপলির সৃষ্টি না হয় সেদিকেও সবিশেষ নজর রাখিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্বে সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, এবার খাতা-কলমে ২৯১টি প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিকের ৭৬টি বই ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হইলেও কার্যত গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানই ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যেমন ৭০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানই ৩৩ কোটি টাকার কাজ পাইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে গুরুতর অনিয়ম। এই ধরনের অশুভ চক্র ভাঙিয়া দিতে না পারিলে বই প্রকাশনা কতিপয় প্রকাশক-ব্যবসায়ীর কাছে জিম্মি হইয়া থাকিবে। আগামীতে এ ধরনের অনিয়ম যাহাতে আর না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রতিবছর সহজে ও সুলভে সকল শিক্ষার্থীর হাতে মাধ্যমিকের বই পৌঁছানো হউক ইহাই আমাদের একান্ত দাবি। পাঠ্যপুস্তক নিয়া কোন পক্ষেরই শিক্ষার্থীদের জিম্মি করা উচিত নয়।